কথাসাঙ্গ

কথাসাঙ্গ

মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক সুধীর কাককার তাঁর Intimate Relation বইটিতে দেখিয়েছেন এই পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে মিথ মানুষের অবচেতনে কী প্রবল শক্তিতে কাজ করে। "Vibrantly alive, their symbolic power intact, Indian Myths Constitute a cultural idiom that aids the individual in the construction and integration in his inner world" (Masculine and Feminine : A view from the Couch. Ch. 7) একই সংস্কৃতি বলয়ে অবস্থিত মানুষের মনে দীর্ঘসঞ্চিত দৈবীমহিমা, পুরাণ, বিভিন্ন শ্রুত কাহিনী ও তার আরোপিত চিহ্নসকল এক ধারে তার সৌন্দর্যবোধ ও অন্য ধারে তার লোকাচার বাহিত ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে কাজ করে। যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবার সদিচ্ছা সত্ত্বেও অবচেতনে প্রবাহিত বোধ ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে, গঠনও করে। আবার সামাজিক মিথ ব্যক্তিমনের গঠন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের প্রতিফলন ঘটিয়ে রূপান্তর আনে।

যেমন লক্ষ্মীন্দর মিথে বেহুলা কোথাও রমণী, কোথাও নদী। কিন্তু দুয়ের মধ্যেই আছে একাগ্রতা, শক্তি। নারী থেকে নদীতে বিবর্তিত হয়েছে সময়ের ধারার জন্য নয়, কবির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের জন্য। আবার চাঁদ সদাগর নামটিতে কেউ বা পেয়েছেন চিরকালীন শুভ ও অশুভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কেউ বা সওদাগরের নৌকা ভাসানর আহ্বানে জীবনের বহতা ধারার ইঙ্গিত শুনেছেন। এই ভাবেই, তেমন কল্পনাপ্রবন কবির দৃষ্টিতে অপার্থিব উর্বশীর সৌন্দর্যসত্তা গৃহস্থ নারীর দারিদ্রজর্জর শরীরে নারী শরীরের একান্ত বাধ্যতামূলক ভারবহনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যেতেই পারে। মানব সভ্যতার উষালগ্নে যে মিথ ভাবনার উৎপত্তি, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা বিবর্তিত হয়েছে। যেমন আধুনিক সাহিত্যে পৌঁছে দেখা যায় অর্জুন, কৃষ্ণ, কর্ণ বা কুন্তী অহল্যা দ্রৌপদী এরা চরিত্র নন, বিশেষ সমাজের ভাবনাও বটে। সময় বিশেষে, বোধ বিশেষে কাব্য নাটকে এঁরা নব নব ভাবনার প্রতীকও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অহল্যা এই পৌরাণিক নামটি মাত্র গ্রহণ করছেন, তার গভীরে আছে উর্বরতা মিথ। তিনি অহল্যাকে দেখেছেন প্রাণবীজের সত্তারূপে। এখানে উর্বরতা মিথই প্রাণময়ী সত্তায় বিবর্তিত হচ্ছে।

পশ্চিম মহাদেশে প্রাচীন মিথের পঠনপাঠন অব্যাহত থাকলেও ভারতবর্ষে পুরাণ যেমন ভাবে আপামর শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে, তার তুলনা কমই পাওয়া যায় । কারণ দীর্ঘদিন রামায়ণ ও মহাভারত এ দুটি মহাকাব্য এবং পুরাণ এ ছিল আমাদের একমাত্র বিনোদন তো বটেই তার সঙ্গে লোকশিক্ষারও বাহক । আমাদের দেশে একজন নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও যে প্রবল নৈতিকতা বোধ কাজ করে, পাপপুণ্যের একটি তুলাদণ্ড তৈরি হয়ে যায় তার কারণই এই । দীর্ঘদিন কথকথা, যাত্রা সবের বিষয়বস্তু ছিল পুরাণকথা । সামাজিক সমস্যা, রাজনীতি এর থেকে ভারতীয়দের চিরদিন প্রিয় ছিল ধর্মকথা । এই জন্য মুখের কথায় সচেতন না হয়েই পুরাণোল্লেখ কত । কারো আঘাত লাগলে স্বাভাবিক ভাবে অন্য জন বলে ওঠে, ষাট ষাট । অর্থাৎ শিশুদের দেবী মা ষষ্ঠী যেন তাঁকে রক্ষা করেন । হাঁচলে বা হাই তুললে বলার রেওয়াজ 'জীব, জীব' । হাঁচি বা হাই আয়ুক্ষয় করে এ গল্প পুরানের । তাকে কাটাতে 'বাঁচ', 'বাঁচ' অর্থাৎ 'জীব', 'জীব' । এমন কত সহস্র উল্লেখ যে দৈনন্দিন জীবনে, ছড়ায়, প্রবাদে মিশে আছে তা আলোচনা করতে গেলে একটি গ্রন্থই রচনা করতে হয় ।

এর আগে বার বার কথা হয়েছে পুরাণ কাহিনী কবিরা নিজেদের মানসরঙে চিত্রিত করেন । বাংলার মধ্যযুগে তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ শিবায়ন কাব্য । এই মঙ্গলকাব্যটি রচনায় কোন মহৎ কবি এগিয়ে আসেন নি । তাই মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে এর উজ্জ্বল ধারার কথা তেমন পাওয়া যায় না । কিন্তু এটি খাঁটি বাঙালি কৃষক মনের সৃষ্টি । অমন যে দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীত ও নৃত্যের গুরু কেবলমাত্র তাঁর বেশভূষা, রহনসহনের জন্য হয়ে গেলেন দরিদ্র কৃষক । অন্যান্য দেবতাদের মত তিনি মহার্ঘ বস্ত্রঅলংকার পরেন না । থাকেন শ্মশানে, গন্ধদ্রব্যের পরিবর্তে অঙ্গে ধারণ করেন ভস্ম, অনুচরগণ ভুত প্রেত । এই নিয়ে পন্ডিতরা গবেষণা করে মরেছেন শিব বহিরাগত দেবতা বা অনার্য কিনা, কিন্তু সাধারণ বাঙালি এখানে নিজেদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখে তাঁকে আপন করে নিয়েছে । অধিকাংশ বাঙালির মত শিবায়ন কাব্যের শিব অলস, অথচ জিহ্বার স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য উদ্ব্যস্ত । অলস এতই যে বাধ্য হলেইতিনি ভিক্ষায় যান । আর যেটুকু পান তাতে বিরাট স্বাদু ব্যঞ্জনের 'লিস্টি' ধরিয়ে দেন গৃহিনী দুর্গার হাতে । ভাঁড়ার ফুরোলে, গৃহিণী তাগিদা দিলে তাঁর ক্ষোভ ক্রোধের শেষ নেই । দুর্গাও ব্যতিব্যস্ত । এদিকে স্বামীর আবদার, অন্যদিকে সংসারটি নিতান্ত ছোট নয় আবার আলাদা উৎপাতও আছে — গণেশের ইঁদুর সব কিছু কেটে ফেলে, অন্য বাহনদেরও সামলাতে হয় ।

অতএব যা চিরকালীন ছবি ছেলেমেয়েদের হাত ধরে পিত্রালয়ে গমন। তাতে শিব অনুতপ্ত। এই যে দরিদ্র ঘরের অনটন, অভিমান দাম্পত্য প্রেম এই নিয়ে নব রূপায়ন পৌরাণিক ভিখারী শিব ও অন্নপূর্ণার ছবি। এর দার্শনিক মাহাত্ম এখানে না থাকলেও জীবনরস আছে।

হরদুর্গার আর একটি ছবি আগমনী বিজয়ার গানে। আগের দিনে ছোট ছোট মেয়েরা পিতামাতার স্নেহাঞ্চল ছেড়ে শ্বশুরালয় যেত। কত কষ্ট, কত মানসিক যন্ত্রণা সেখানে। অথচ রুদ্ররূপী সমাজের ভয়ে সব সহ্য করতে হত দুপক্ষকে। পূজোর সময় মাত্র পাঁচটি দিনের মতন তারা হয়ত আসতে অনুমতি পেত। তাই আগমনী গান মা দুর্গার পিত্রালয় আগমন মাত্র নয়, স্নেহের কন্যার আগমন। দুইয়ে মিলে এক হয়ে যায়। মেনকার অধীর প্রতীক্ষা সব বাঙালি মায়ের হৃদয়ের ধ্বনি নবনী নিশি পোহালে' মা দুর্গার সঙ্গে কোলের মেয়েটিরও বিদায় আসন্ন। তাই তো প্রতিবছর বিজয়ার মূর্তি বিসর্জনের সময় সব মায়েদের চোখে জল আসে। রামপ্রসাদ তাঁর শক্তিগীতির শক্তি সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব তুলে এনেছেন। তাঁরা এসব বোঝেন না তাঁরাও মনে রেখেছেন তাঁকে ও কমলাকান্ত চক্রবর্তীকে আগমনী বিজয়ার গানের জন্য।

আবার ভারতচন্দ্র আনলেন শিবের বিবাহ মুহূর্ত তাঁর অনবদ্য ভাষা ও ছন্দে। শুধুমাত্র কুলরক্ষার জন্য অপছন্দের জামাইবরণ করতে হয় মাকে, অভ্যর্থনা করতে হয় পিতাকে। এটাও তো বাঙালি সংসারের ছবি। নিরুপায় পিতা তাঁর বালিকা কন্যাকে সমর্পন করবেনই। কার হাতে, তা ভাগ্য নির্দ্ধারিত বলে মেনে নেওয়াতেই স্বস্তি। তবু মনের কষ্ট যায় না। তাই হয়ত কখনও তিনি প্রকাশও করে ফেলেন। এখানেই সংসারে মায়েদের স্থান। তিনি স্বামী সন্তান উভয়কে শান্ত করেন।

এ দেশের মহাকাব্য দুটি রামায়ণ ও মহাভারত বিবর্তনের ক্ষেত্রে অজান্তেই হয়ত বিবর্তনের রীতিটি একটি যেন পথ অনুসরণ করেছে। রামায়ণের ক্ষেত্রে ভাবগত পরিবর্তন হয়েছে বেশি এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষায় প্রধান চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন মেঘনাদবধ কাব্যে রাম কখনই আদর্শ চরিত্র নন। তাই রাম ও রাবনের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছেই। কিন্তু স্ত্রী চরিত্র পরিবর্তিত হয় নি। রক্তকরবীতেও রাজাকে একাধারে রাবন ও বিভীষণ কল্পনায় তাঁর চরিত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে এবং নন্দিনী এখানে সীতার মত শোকে লজ্জায় ধরণী গর্ভে

আশ্রয় না নিয়ে প্রতিবাদ করেছে। মহাভারতের কাহিনী চরিত্র পরিবর্তন ঘটেছে সব সময় না হলেও, অনেক ক্ষেত্রে। বিশেষত: রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবিকতা বোধ ও আধুনিক চিন্তার ফলে সবথেকে বেশি বদলেছেন। কিন্তু মূল ভাব বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি। হয়ত মহাভারতের মূল কাহিনী একেবারেই শিথিল নয় বলেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হবে কি না এ নিয়ে দ্বিধা থাকতে পারে কিন্তু আঠারো দিনের এই রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের একটি ঘটনাও বদলান যায় না। এমনকি এর সূত্রপাতের ঘটনাও নয়। মহাভারতের কাহিনী বিরাট,, বৈচিত্র্যও বেশি। সেইজন্য এর থেকে কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচনের সুযোগও বেশি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আধুনিক যুগে পর্যন্ত মিথ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি কোনও শক্তিশালী কবি ও নাট্যকারের নাম উল্লিখিত না হয়ে থাকে, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি। যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মিথ সম্পর্কীয় ছাড়া সামগ্রিক কাজের কথা বলা যায় নি। প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে হয়েছে। অনেকে আবার অন্য ভাবধারায় বেশি ভাবিত। মিথ তাঁদের কাব্যে এলেও তত প্রাধান্য পায় নি। মিথ বিষয়টি আমাকে বরাবর আকর্ষণ করেছে। কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ও বার্নিক রায় ব্যতীত বাংলা ভাষায় মিথ সম্বন্ধীয় পুস্তক খুব কম হয়েছে। বিশেষত: পাশ্চাত্য মিথ বিশেষজ্ঞদের বৈজ্ঞানিক ধারার উল্লেখ আরও কম দেখা যায়। তত্ত্ব ও তথ্য সহযোগে বাংলা সাহিত্যে মিথ কিভাবে এসেছে, কিভাবে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে এর গতিপথ অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক। সেই জন্য আমি আমার অভিসন্দর্ভে এই বিষয়টি নির্বাচন করতে উৎসাহী হয়েছি।